প্রথম আলো

তারিখ 03 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

কো-অপারেটিভ শিক্ষা ■ সজল চৌধুরী

অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, গড়ে উঠছে অনেক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। তবে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি, নাকি ডিগ্রিধারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছি, তা একটা বড় প্রশ্ন।

ইংরেজিতে প্রচলিত 'কো-অপারেটিভ' শিক্ষাপদ্ধতি এমন একটি ধারণা, যেখানে সমসাময়িক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী স্বশিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি দেওয়া ছাড়াও কিছু কাজ করে। তারা শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনেক সৃজনশীল প্রকল্প, গবেষণা ইত্যাদি সম্পাদন করে। সেগুলো সামাজিক অবকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এমন কিছু গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে, যার বাজারমূল্য সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। শিক্ষার্থীদের তৈরি করা প্রকল্পগুলো বাজার থেকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করবে এবং অর্জিত অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নির্বাহ করেও অতিরিক্ত অর্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে পারবে।

ধরা যাক, 'হস্তশিল্প' নামক একটি বিভাগ, যেখানে চার বছর মেয়াদি (শিক্ষার সময় বিবেচনাযোগ্য) হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে। বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে সিলেবাস অনুযায়ী, যা অবশ্যই চাহিদা অনুযায়ী বাজারমুখী হতে হবে কিংবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলো বিবেচ্য হবে।

দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে সংযুক্ত থাকতে পারে নতুন নতুন গবেষণা আর নির্মাণে। এমনকি এই বিভাগটির মাধ্যমে দেশের আনাচকানাচে লুকিয়ে থাকা আমাদের হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্যকে আমরা নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা 'হস্তশিল্প' বিষয়টিকে দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও সমুন্নত করতে পারে।

এভাবে চারু ও কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নগর অঞ্চল পরিকল্পনা, দুর্যোগ মোকাবিলা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষিবিদ্যাসহ অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে পারে।

দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোর পেছনে সরকারকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সেই অর্থ ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ওই অর্থ থেকে গবেষণা প্রকল্প চালাতে পারে না।

যদি সরকারি কোনো অনুদানের ব্যবস্থা হয়, সে অনুদানের অর্থ ছাড় করাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখা যায়। তা ছাড়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার-পাঁচ বছর মেয়াদি যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় (কিছু কিছু কারিগরি শিক্ষা ছাড়া) তার সঙ্গে সামাজিক চাহিদার সম্পর্ক থাকে না। সেই শিক্ষাপদ্ধতি দেশের কোনো অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রদান করতে সক্ষম হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে চার-পাঁচ বছর পড়াশোনা করে বেরিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজতে থাকে, কিন্তু কর্মসংস্থানের প্রকট অভাবের কারণে চাকরি পায় না, তখন তাদের কাছে অর্জিত জ্ঞানের কোনো মূল্য থাকে না। অথচ এ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালাতে আর নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। শিক্ষকস্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা, সহিংসতা ইত্যাদি বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সামাজিক অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং দেশের অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের একটা চাপ।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই শিক্ষাপদ্ধতি কতটা বাস্তবসম্মত, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখার বিষয়। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা কতটুকু, সেটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনা ও গবেষণার বিষয়। এ প্রসঙ্গে উন্নত দেশগুলোর কিছু চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রেট ব্রিটেনে রবার্ট ওয়েন কো-অপারেটিভ শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন বস্ত্রশিল্পে কর্মরত জনগোষ্ঠীর জন্য। বিশ শতকের শুরুতে লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ স্থপতি হারমান স্নেইডার ধারণা করেন, শুধু শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেখানে সরাসরি ব্যবহারিক কাজের সুযোগ নেই এবং যা সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে না, যা তারা শ্রেণীকক্ষের বাইরে গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ার আগেই করে থাকে। পরে কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয় অল্প পরিসরে এই ধারণার শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করে এবং ১৯০৬ সালের দিকে সফলতা অর্জন করে। বর্তমানে ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্লোরেডিয়া স্কুল অব টেকনোলজি, জর্জিয়া স্কুল অব টেকনোলজি, রোচেস্টার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিসহ বিশ্বের নামিদামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন রয়েছে, যা সমাজের জন্য সফলতা বয়ে নিয়ে আসছে।

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য, এ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিপূরক জ্ঞান ও গঠনবিন্যাস আর অভিজ্ঞতা না থাকলে সফলতা অর্জন করা অনেক কষ্টকর। তবে আমাদের দেশের ব্যাঙের ছাতার মতো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুরুতে দু-একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন এই ধারণা নিয়ে এগোতে পারে, যা হয়তো শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য বসে না থেকে ছাত্রাবস্থায়ই চাকরির ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

● **সজল চৌধুরী: সহকারী অধ্যাপক, স্থাপত্য ও পরিবেশবিষয়ক গবেষক, স্থাপত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।**